দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

পাঠাগার ও ভূতের পা

বিশ্বায়নের যুগে এমন দৃশ্য আমরা ইন্টারনেটে প্রায়শই দেখিতে পাই যে, উন্নত বিশ্বের কোনো অফিসগামী মানুষ বই পড়িতেছেন চলতি পথে। শিক্ষিত ও উন্নত দেশের মানুষের কাছে বই ও গ্রন্থাগার জীবনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো। কিন্তু আমরা উন্নত জাতি হইতে চাহিলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাঁটিতেছি উল্টা পথে। দৈনিক ইত্তেফাকে গত ৩ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটির ৯৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে পাঠাগার চালু রহিয়াছে মাত্র ৭টি ওয়ার্ডে। তাহাও নামকাওয়াস্তে। কারণ, এসব পাঠাগার কক্ষে রাখা হয় কমিউনিটি সেন্টারের থালা-বাসন, কোথাও পাঠাগার কক্ষ ও বইয়ে মাকড়শা জাল বোনে অলস সময়ক্ষেপণে। অন্যদিকে এক দশকের ব্যবধানে ঢাকা দক্ষিণ সিটির পাঠাগারের সংখ্যা নামিয়া আসিয়াছে ২৩ হইতে ৭টিতে।

প্রশ্ন হইল, যেখানে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, সেখানে উল্টা টিম টিম করিয়া জ্বলা পাঠাগারসমূহ কেন বন্ধের উপক্রম হইবে? গত এক দশকে সিটি করপোরেশনের জনসংখ্যা ও সীমানা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একই সঙ্গে বাড়িয়াছে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও। এই সময় স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়িয়াছে বহুগুণ। অথচ বৃদ্ধি পায় নাই কেবল করপোরেশনের পাঠাগারের সংখ্যা! পাঠকের অভাবই কি ইহার প্রধান কারণ? কিন্তু প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, পাঠক রহিয়াছে পর্যাপ্তই। মূলত অভাব রহিয়াছে কর্তৃপক্ষেরই সদিচ্ছার। আর সুস্থ পরিবেশের অভাবেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে ১৬টি পাঠাগার। ইহার মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে কাগজে-কলমে পাঁচটি পাঠাগার থাকিলেও চারটি পাঠাগারেরই কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। নগর মহানগরের পাঠাগার তো কেবল পুস্তক পাঠের জন্য নহে, এখানে বসিয়া স্থানীয় জনসাধারণ বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, গবেষণাপত্র পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। মূলত বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্মিলন ঘটে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগারে, যেখানে বসিয়া কৌতূহলী পাঠক যাচাই করিতে পারেন বহুমতের বহু দৃষ্টিভঙ্গির সমৃদ্ধ তুল্যচিত্র। ইহা সময় বাঁচায় ও অর্থেরও সাশ্রয় করে। সুতরাং গ্রন্থাগার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ না থাকুক, যেটুকু অবকাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে—আগ্রহী পাঠকের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ, বইপত্রের বিকল্প কেবল বইপত্রই। আজকাল কাগজে ছাপানো বই দিয়া পাঠাগার গড়িবার পাশাপাশি অনলাইনেও পাঠাগার গড়িয়া তোলা যায়। দুর্লভ বইয়ের পাশাপাশি নিত্যনূতন বইও ইন্টারনেট হইতে আপলোড করা যায়। সুতরাং সদিচ্ছা থাকিলে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেকোনো পাঠাগারকে পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভব কিছু নহে।

মহানগরের বেশিরভাগ মানুষের একটুখানি গৃহের ছোট্ট কোণে আজ আর বইয়ের স্তূপের জায়গা নাই। অথচ বইপত্রের নিকট ফিরিয়া যাওয়াটাই আমাদের ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সব অশান্তি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ উপায়। হীরক রাজার দেশে গ্রন্থাগার পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এই কারণে যে—ইহারা (জনগণ) যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে। এই তির্যকবাণী বলিয়া দেয়, সমাজ-রাষ্ট্রকে অগ্রসর করিতে গ্রন্থাগার কী বিপুল ভূমিকা রাখে। ভূতের পা নাকি উল্টা দিকে থাকে! পাঠাগার বৃদ্ধির পরিবর্তে বিদ্যমান গ্রন্থাগারসমূহে নষ্ট করিয়া আমরা কেন উল্টা পথে হাঁটিতেছি?